বাংলাদেশের পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে নৌ-পরিবহণের ভূমিকা

মো: মোয়াজ্জেম হোসেন খান*

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের সার্বিক পরিবহণ ব্যবস্থায় নৌ-পরিবহণের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে প্রবন্ধের প্রথমাংশে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে নৌ-পরিবহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের দেশের নদী প্রণালীগুলোর ভূমিকার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমাদের দেশের নৌ-পরিবহণ উপ-খাতের বিদ্যমান অবস্থা বিশে-ষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের তৃতীয়াংশে বাংলাদেশের তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রে নৌ-পরিবহণের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। আর সবশেষে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ অথচ অবহেলিত এ খাতটির উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য ও পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভূমিকা

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই পরিবহণের যাত্রা শুরু হয়। শুরু থেকে অদ্যাবধি নৌ-পরিবহণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণের স্থানটি দখল করে আছে। আজও পৃথিবীতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের শতকরা প্রায় আশি ভাগই নৌ-পথে হয়ে থাকে। আমাদের দেশ অত্যন্ত শক্তিশালী চারটি নদী প্রণালী দ্বারা সুষমভাবে আবৃত। তা'ছাড়া আমাদের দেশের দক্ষিণ সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে সমুদ্র-মহাসমুদ্রের দিকে উন্মুক্ত। এ যেন প্রকৃতির অসীম আশির্বাদ। অথচ আমরা প্রকৃতির এ আশির্বাদের কানাকড়িও কাজে লাগাতে পারি নি। বৃটিশ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনামলে আমাদের দেশের নদী প্রণালী ও সমুদ্রের অফুরন্ত সম্ভাবনা কাজে না লাগানোর বিষয়টি বোধগম্য হলেও স্বাধীনতার সাইত্রিশ বছর পরও কেন এ সম্ভাবনা আমরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছি বা হচ্ছি তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না আমরা। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই আমরা এ প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বেড় করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে: আমাদের দেশের অর্থনীতিতে নৌ-পরিবহণের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপস্থাপন করা। আর এ প্রধান লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ।

১। আমাদের অর্থনীতিতে সমুদ্র ও নদী প্রণালীগুলোর ভূমিকার মূল্যায়ন করা ;
২। বাংলাদেশের বিদ্যমান নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার একটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা ;
৩। নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা ;
৪। নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায় বাতলানো এবং এর সম্ভাবনার দিগন্তসমূহ চিহ্নিত করা।

পদ্ধতি ও তথ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য মূলত: প্রকাশিত উৎস থেকে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে: পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা, বাংলাদেশের পরিকল্পনা গ্রন্থসমূহ এবং দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র। এছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত বর্ষ পত্রের বিভিন্ন সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ। সর্বোপরি দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ ও প্রবন্ধেরও সহায়তা নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নৌ-পরিবহণের গুরুত্ব

সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, খাল-বিল, ডোবা-পুকুর ও হাওর-বাওরের দেশ বাংলাদেশ। চারটি অত্যন্ত শক্তিশালী নদী প্রণালী দ্বারা আমাদের দেশ বিধৌত যার রয়েছে শত শত শাখা ও প্রশাখা। দক্ষিণ সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে সাগর-মহাসাগরের দিকে উন্মুক্ত। রয়েছে হাজার হাজার খাল-বিল, ডোবা-পুকুর ও হাওর-বাওর। না চাইতেই প্রকৃতি উজার হস্তে আমাদেরকে দান করেছে এ বিশাল ও রকমারী জলাধারসমূহ। হিমালয় ও তিব্বতের পর্বত শৃঙ্গ থেকে যাত্রা শুরু করে নদী প্রণালীগুলো চীন, ভারত, নেপাল ও ভূটান হয়ে আমাদের দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এ নদী প্রণালীগুলো পাহাড়-পর্বত থেকে বরফ গলা মিষ্টি পানি নিয়ে আসছে আমাদের জন্যে। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ মৌসুমী বৃষ্টির জল। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে বছরে প্রায় আট মাসই (বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ) কম-বেশী বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয় বর্ষা মৌসুমে (আষাঢ় ও শ্রাবণ) যখন গোটা বাংলাদেশ প্লাবিত হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের রয়েছে মিষ্টি ও লবন পানির এক বিশাল ও অফুরন্ত উৎস। এ যেন প্রকৃতির এক অসীম আশির্বাদ।

প্রাচীনকাল থেকেই উপরে বর্ণিত জলাধারসমূহের বিশাল জলরাশিকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে জল বা নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা। এসব জলাধার বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষের পরিবহণ চাহিদা মেটাচ্ছে। প্রকৃতি নিজ হস্তে আমাদের জন্যে নানা রকমের ও আকারের বিপুল সংখ্যক জলাধার নির্মাণ করে দিয়েছে। আর সেকারণেই প্রাচীন কাল থেকে এখানে নৌ-পরিবহণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ হিসেবে গড়ে উঠেছে। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এদেশের প্রায় আশি শতাংশ যাত্রী ও পণ্য নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত হতো। বর্তমানেও প্রায় অর্ধেক যাত্রী ও পণ্য এ ব্যবস্থায় পরিবাহিত হয়ে থাকে। আর বৈদেশিক বাণিজ্যের তো শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই হয়ে থাকে নৌ-পথে।

সর্বোপরি বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্ত সাগর-মহাসাগরের দিকে উন্মুক্ত থাকায় প্রকৃতিগতভাবে আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছি। উন্মুক্ত সমুদ্রপথের জন্যে ইউরোপের দেশগুলো

বহুবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, বিশেষ করে জার্মানী তার প্রতিবেশী দেশগুলোকে বার বার আক্রমণ করেছে এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত লাগিয়েছিল। জাপান ও সিংগাপুরের মত প্রাকৃতিক সম্পদহীন দেশগুলো শুধু সমুদ্র পথের সুবিধা ব্যবহার করে অন্য দেশের সম্পদ কাজে লাগিয়ে তাদের দেশের চোখ ধাঁধানো উন্নতি ঘটিয়েছে। দূর্ভাগ্য আমাদের, সুযোগ থাকা সত্বেও আমরা তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছি।

পরিবহণ ব্যবস্থাকে মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়। মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে হৃদপিণ্ড। কোন কারণে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া থেমে গেলে বা বাধাগ্রস্থ হলে হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায় এবং মানুষটি মরে যায়। ঠিক তেমনিভাবে পরিবহণ ব্যবস্থা যদি দুর্বল বা ভঙ্গুর হয় তবে অর্থনীতির স্বাস্থ্যও দুর্বল বা ভঙ্গুর হতে বাধ্য। বাংলাদেশে বিদ্যমান চার ধরনের পরিবহণের মধ্যে জল পরিবহণ বা নৌ-পরিবহণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। (৭) কারণ:

১। জলের জন্যে কোনও দাম দিতে হয় না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃতি অত্যন্ত উজার হস্তে অসংখ্য জলাধার ভর্তি করে বিপুল জলরাশি আমাদেরকে দান করেছে যাকে কেন্দ্র করেই মূলত: এখানে প্রাচীন কাল থেকে গড়ে উঠেছে বিশাল এক নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা।

২। ইহা হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা পরিবহণ মাধ্যম। জলের দাম দিতে হয় না বলে জল বা নৌ-পরিবহণের ভাড়াও অন্যান্য পরিবহণ মাধ্যমের তুলনায় বেশ কম।

৩। নৌ-পরিবহণ হচ্ছে অত্যন্ত দরিদ্র বান্ধব এক পরিবহণ ব্যবস্থা। কারণ খরচ বা ভাড়া কম হওয়ায় দরিদ্ররা এ পরিবহণ মাধ্যমই বেশী ব্যবহার করে থাকে।

৪। ইহা অত্যন্ত সহজলভ্য পরিবহণ ব্যবস্থা। নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থায় যেকোন দূরত্বে যাতায়াত সম্ভব যা অন্যান্য মাধ্যমে সম্ভব নয়।

৫। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ করা যায়। আধুনিক একটি বড় আকারের জাহাজে কয়েক হাজার যাত্রী পরিবহণ করা যায়। আবার একটি কার্গো বা ট্যাংকারে হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ টন পণ্য বা তেল ও গ্যাস পরিবহণ করা যায়।

৬। নৌ-পরিবহণ মাধ্যমসমূহের গতি অপেক্ষাকৃত কম হলেও, ইহা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পরিবহণ ব্যবস্থা।

৭। অনেক ক্ষেত্রে দুর্গম এলাকাতেও নৌ-পরিবহণের মাধ্যমে পৌছানো সম্ভব। যেমন উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণের কাজটি নৌ-পরিবহণ ছাড়া ভাবাই যায় না। সম্ভবত: এক্ষেত্রে নৌ-পরিবহণের বিকল্প এখনও আবিস্কৃতই হয় নি।

৮। সর্বোপরি নৌ-পরিবহণ তথা সমুদ্র পরিবহণ ব্যবস্থার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে প্রভূতভাবে ত্বরান্বিত করতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা যার কানাকড়িও বর্তমানে আমরা কাজে লাগাতে পারি নি। জাপান ও সিংগাপুরের মত আমরাও অন্য দেশের বাজার ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সেই অবাস্তবায়িত অফুরন্ত উন্নয়ন সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারি।

বাংলাদেশের নৌ-পরিবহণ খাতের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের নৌ-পরিবহণের প্রধান উৎস হচ্ছে এর চারটি সুবৃহৎ নদী প্রণালী ঃ গঙ্গা-পদ্মা নদী প্রণালী, ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা নদী প্রণালী, মেঘনা নদী প্রণালী ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় নদী প্রণালী (কর্ণফুলী নদী প্রণালী)। এগুলোর রয়েছে আবার অসংখ্য শাখা ও উপ-শাখা নদী। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, একাদশ শতাব্দীতেও আমাদের দেশে নদীর সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার। নদীগুলো ছিল প্রশস্ত, গভীর ও পানিতে টইটুম্বুর, আর বর্ষাকালে প্রমত্তা। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশের নদীর সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে বর্তমানে মাত্র ২৩০টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ১৭টি বর্তমানে মৃত প্রায়। বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে বর্তমানে মাত্র ১০০টির সাংবাৎসরিক নৌ-চলাচলের মতো গভীরতা ও প্রশস্ততা আছে। ১৯৭১ সালে যেখানে বাংলাদেশের নদী পথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২৪,১৪০ কিলোমিটার, সেখানে বর্তমানে তা মাত্র ৩,৮০০ কিলোমিটারে এসে ঠেকেছে। অবশ্য বর্ষা মৌশুমে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রতি বছর আমাদের নদীসমূহে প্রবাহিত পানির মোট পরিমাণ হচ্ছে ১,০৭৪ বিলিয়ন ঘন মিটার। এর সাথে বছরে বৃষ্টির পানি এসে যুক্ত হয় প্রায় ২৫১ বিলিয়ন ঘন মিটার। অথচ নদীগুলোর নাব্যতা রক্ষায় মোট পানির প্রয়োজন মাত্র ১৫০ বিলিয়ন ঘন মিটার। প্রশ্ন হচ্ছে : বাকী পানি যায় কোথায়? বেশীর ভাগ নদী মরে যাওয়াতে এবং সার্বিকভাবে নদীর তলদেশ স্ফীত হওয়ার ফলে জল ধারণক্ষমতা সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাকী পানি গড়িয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ছে- অপচয় হচ্ছে। নদীর প্রতি অবহেলা ও অত্যাচারের মাধ্যমে আমরা নৌ-পথের মত অত্যন্ত সস্তা, সহজলভ্য, দরিদ্রবান্ধব, দৃষ্টিনন্দন ও আরামদায়ক পরিবহণ পন্থাটিকে বলা যায় একেবারে বেহাল অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছি।

আমাদের দেশের নদীসমূহের এরকম করুণ অবস্থার পেছনে প্রাকৃতিক কারণ যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি মনুষ্যসৃষ্ট কারণও রয়েছে। প্রাকৃতিক কারণগুলো হচ্ছে ঃ

১। ***ভূমিকম্প ঃ*** ভূমিকম্পের ফলে নদীর তলদেশ স্ফীত হয়ে যায় এবং তার জল ধারণক্ষমতা হ্রাস পায়। এমন কি নদীর গতিপথও পরিবর্তিত হয়ে যায়। ১৮৯৭ সালে প্রলয়ংকারী এক ভূমিকম্পের ফলে ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর তলদেশ সাংঘাতিকভাবে স্ফীত হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে নদীটি মৃতপ্রায় নদীতে রূপান্ত রিত হয়। এই ভূমিকম্পের কারণে ব্রক্ষ্মপুত্রের গতিপথেরও পরিবর্তন হয় : একটি শাখা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যমুনা নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয় এবং অন্যটি অর্থাৎ মূল নদীটি ভৈরবের কাছে মেঘনার সাথে মিলে যায় (১১)।

২। ***পলি পতন ঃ*** বছরে উজান থেকে নদী বাহিত পলির পরিমাণ প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন টন যার মধ্যে ৪০-৪৫ মি: টন আমাদের দেশের নদীগুলোর তলায় জমা হয়। পলি জমে ভরাট হয়ে ইতোমধ্যেই আমাদের দেশের প্রায়, দু'শতাধিক নদী মৃত্যুবরণ করেছে। বাঙালি, ব্রক্ষ্মপুত্র, ধরলা, যমুনা, পদ্মা ও তিস্তা নদী পলি জমাটের কারণে তাদের নাব্যতা হারাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর নিচ দিয়ে প্রবাহিত যমুনাকে এখন আর নদী বলে সনাক্ত করা যাচ্ছে না বিশেষ করে শুষ্ক মৌশুমে। এছাড়া নদীর মুখে পলি জমার কারণে আমাদের দেশের প্রায় ৭৭% নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে মেঘনা, ফেনী, মুহুরী, কর্ণফুলী, বাকখালী, তেতুলিয়া, ইলিশা, আন্দারমানিক, পায়রা, লোহালিয়া, রায়মঙ্গল, আরপাং, শিবসা, পশুরসহ সুন্দরবনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও উপনদীসমূহ।

৩। ***নদী ভাঙ্গন ঃ*** আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক নদী ব্যাপক ভাঙ্গনের শিকার। প্রধানত: বর্ষা মৌশুমে মেঘনা, যমুনা, পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, তেতুলিয়া, বলেশ্বর, ধরলা, কির্তনখোলা, পায়রা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি

নদী ভয়াবহ ভাঙ্গনের কবলে পতিত হয়। আর পাড় ভাঙ্গা মাটিও নদীর তলদেশ ভরাটে বিশেষ অবদান রাখছে।

৪। পানির প্রবাহ হ্রাস ঃ শুষ্ক মৌশুমে বিশেষ করে শীতকালে আমাদের দেশের প্রায় সকল নদীর পানি প্রবাহ কমে যায়। এর প্রাকৃতিক কারণ হচ্ছে: বৃষ্টিপাত কম হওয়া ও পাহাড়ে বা পর্বতে বরফ জমে যাওয়া।

আর মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১। নদী দখল ঃ আমাদের দেশের ক্ষমতাধর বিত্তবান বিশেষ করে শাসক গোষ্ঠির দখল ও জবর দখলের শিকার হয়ে ১৫৮টি নদী বর্তমানে অত্যন্ত সরু হয়ে পড়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে– বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ, বংশী (টঙ্গী), কালিগঙ্গা (মানিকগঞ্জ), কপোতাক্ষ ও নবগঙ্গা (যশোর), নরসুন্দা ও কলাগাছিয়া (কিশোরগঞ্জ), সুরমা (সিলেট) ও কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম)। আর মৃত অথবা মৃতপ্রায় নদীগুলো তো বহু পূর্বেই দখল হয়ে গেছে।

২। পানির প্রবাহ হ্রাস ঃ শুষ্ক মৌশুমে বাংলাদেশের প্রায় শতভাগ নদীর পানির প্রবাহ ও পরিমাণ হ্রাস পায় মারাত্মকভাবে। পার্শ্ববর্তী ভারত থেকে আসা ৫৪টি নদীর উজান অঞ্চলে (ভারতীয় অংশে) ভারতীয় সরকার কর্তৃক নির্মিত বাঁধ, ব্যারেজ ও বিভিন্ন প্রয়োজনে পানি প্রত্যাহারমূলক কার্যক্রমই এর প্রধান কারণ। ভারতের তথাকথিত আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে ১৭৩ বিলিয়ন ঘন মিটার পানি সরিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা'ছাড়া উজানে ভারতের গজালডোবা বাঁধের ফলে আমাদের তিস্তা নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। আর বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ ব্যারেজ নির্মাণের ভারতীয় পরিকল্পনা এখন বাস্তবায়নাধীন। ১,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদনের লক্ষ্যে এ বাঁধ নির্মিত হলে বর্ষাকালেই বাংলাদেশের মেঘনার পানি অন্তত: পাঁচ ফুট হ্রাস পাবে। আর শীতকালের অবস্থা তো সহজেই অনুমেয়। সর্বোপরি টিপাইমুখ বাঁধের নির্মাণ কাজ শেষে চালু হলে সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনার জল প্রবাহ সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পাবে। ফলে সমুদ্রের নোনা পানি সিলেট পর্যন্ত পৌছে যাবে। তদুপরি ভারতের উত্তর-পূর্ব পাহাড়ী জনপদের ৭টি রাজ্যে ভারত সরকার ইতোমধ্যে ২৮টি বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ ও চালু করেছে এবং আরও শতাধিক এরকম বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গেছে যে, ভারত ঐ এলাকার পরিবেশ, জীবন-জীবিকার বিনিময়ে হলেও তার ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোকে 'পাওয়ার হাউজ' হিসেবে ব্যবহার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর সেজন্যে আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বের এ বৃহৎ এলাকায় ভারত আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ সর্বমোট এক লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে আরও দু'শতাধিক বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। আর ভারতের এ ধরনের উচ্চাকাংখী পরিকল্পনা সত্যি যদি বাস্তবে রূপ লাভ করে, তা'হলে ভাটির দেশ বাংলাদেশে পানির সংকট দেখা দেবে অবশ্যাম্ভাবীভাবে এবং আমাদের নদীগুলো হারাবে নাব্যতা।

৩। বেষ্টনী স্থাপনা ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে শুরু করে বিগত অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময়ে প্রায় পাঁচ শতাধিক তথাকথিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ বাঁধ নির্মাণ এবং স্লুইজ গেট করার মাধ্যমে আমাদের দেশে মিলিয়ন মিলিয়ন হেক্টর আবাদী জমিকে নদীর পানি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এর ফলে শুধু ঐ সকল জমির উর্বরতাই হ্রাস পায় নি, সাথে সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা। যশোরের ভবদহের জলাবদ্ধতা হচ্ছে এ নির্বুদ্ধিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আর প্রয়োজনের সময় আশেপাশের পানি নদীগুলো না পাওয়াতে তাদের পানি প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে পলি পতনের পরিমাণ।

৪। পরিবেশ বিপর্যয় ঃ আমাদের দেশের সীমান্ত অতিক্রান্ত নদীগুলোর প্রবাহ পথে ভারতসহ প্রতিবেশী অন্যান্য দেশসমূহে এবং বাংলাদেশে ব্যাপক পরিবেশ দূষণ, পানি দূষণ, বৃক্ষ নিধন, গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া, পাহাড় কাটা, উন্নয়ন কার্যক্রম, বোল্ডার নিক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ও আমাদের নদী বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। সারা বিশ্বের মত উপমহাদেশের আবহাওয়াও ক্রমশই উষ্ণতা লাভ করছে। ফলে হিমালয়ের বরফ গলার হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাড়ছে বন্যার প্রকোপ, ভাঙ্গছে নদীর পাড়, জমছে আরো পলি আমাদের নদীগুলোর তলদেশে। এসব কিছুর প্রান্তিক ফলাফল হচ্ছে নদী ভরাট ও মৃত্যু।

৫। জৈব ও রাসায়নিক দূষণ ঃ আমাদের দেশের প্রায় এগারো শতাংশ নদী শিল্প বর্জ্য নি:সৃত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা দূষিত হয়ে গেছে। বিশেষকরে শীতকালে বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা ভয়ানক বিষাক্ত রূপ ধারণ করে। এছাড়া বছরে দেশে ১.৬০ মিলিয়ন টন রাসায়নিক সার, চার থেকে পাঁচ হাজার টন কীটনাশক ব্যবহৃত হয়, যার একটা বিরাট অংশ পানিতে মিশে শেষ পর্যন্ত নদীতে পৌছায়। সর্বোপরি বিভিন্ন ধরনের নৌ-যান থেকে বছরে প্রায় আড়াই বিলিয়ন টন জৈব বৈর্জ্য নদীতে নিক্ষিপ্ত হয় যার একটা বিরাট অংশ পলি হিসেবে নদীসমূহের তলদেশে জমা হয়ে নদী ভরাটে অবদান রাখছে। এর সাথে আরও যুক্ত হচ্ছে খাল-বিল থেকে আগত লক্ষ লক্ষ টন বিভিন্ন ধরনের জৈব বৈর্জ্য।

উপরোক্ত কারণে আমাদের দেশের সকল নদীই আজ পর্যায়ক্রমে ও সত্যিকার অর্থেই মৃত্যুমুখী। ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের সরকারগুলো নদী ধ্বংস প্রতিরোধে কার্যকর কিছুই করতে পারে নি। বরং তারা ভুল নীতি, অবহেলা, অদক্ষতা ও দুর্নীতির মাধ্যমে এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। এতক্ষণ আমরা নৌ-পরিবহণের প্রধান উপাদান – জলাধার তথা বাংলাদেশের নদীগুলোর উপর আলোকপাত করলাম। এবারে আমরা এর আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান – নৌযান সম্পর্কে আলোচনা করবো।

আমাদের দেশের নৌ-পরিবহণে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতই বিদ্যমান। তবে সংখ্যার দিক দিয়ে বেসরকারী খাতেরই আধিক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বেসরকারী খাতে আবার অসংগঠিত খাতের রাজত্ব লক্ষ্যনীয় (সারণী-১)। সারণী-১ থেকে আমরা সহজেই লক্ষ্য করতে পারি যে, সরকারী খাত শুধুমাত্র সংগঠিত খাতেই বিদ্যমান। এক্ষেত্রেও বেসরকারী খাতেরই আধিক্য বিদ্যমান। ২০০০-০১ সালে যেখানে সরকারী খাতের দু'টি সংস্থা যথাক্রমে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন এর মোট নৌ-যানের সংখ্যা ছিল ২৩৭টি (১৩+২২৪) সেখানে বেসরকারী খাতের নৌ-যানের সংখ্যা ছিল ৩,৬২৮টি। পাঁচ বছর পর ২০০৪ – ০৫ সালে এসে দেখা যাচ্ছে যে, সরকারী খাত আরও দুর্বল হয়েছে এবং বেসরকারী খাত চাঙ্গা হয়েছে। অপরদিকে অসংগঠিত খাতের গোটাটাই বেসরকারী মালিকানায় চলছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ২০০০–২০০৫ এ পাঁচ বছরে সংগঠিত বেসরকারী খাতে নৌযানের সংখ্যা বাড়লেও অসংগঠিত বেসরকারী খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে তা হ্রাস পেয়েছে। ২০০০–০১ সালে যেখানে বেসরকারী সংগঠিত ও অসংগঠিত খাতে নৌযানের সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৬২৮ টি ও ২৭৩,০০০ টি ছিল, সেখানে ২০০৪–০৫ সালে উক্ত খাতসমূহের অংকগুলো গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩,৯৩৭ ও ২৪৬,০০০ এ। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামোর অনুপস্থিতি, দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থা, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে সম্ভবত: এ রকম একটা চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

এবারে দেখা যাক নৌযানের মাধ্যমে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের অবস্থা। সারণী–২ এ উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৭ সালে ১৭.০% যাত্রী এবং ২৮.০% পণ্য নৌযানের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়েছে। ২০০২ সালে সেই অংকগুলো গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮.০% ও ২০.০% এ। রেল পরিবহণের অবস্থা আরও শোচনীয় – যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে এর অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ১১.০% ও ০৭.০% এবং ১২.০% ও ০৮.০%। প্রায় তিন চতুর্থাংশ যাত্রী ও পণ্য পরিবাহিত হয়েছে সড়ক পথে। অথচ সড়ক পথে পরিবহণ ব্যয় অত্যন্ত বেশী (সারণী–৩)। বাংলাদেশে উৎপাদন ব্যয় ও পণ্য মূল্য বেশী

সারণী ১ : বাংলাদেশের সংগঠিত ও অসংগঠিত নৌ-পরিবহণ উপখাতসমূহে সরকারী ও বেসরকারী খাতের অংশ, ২০০০ – ২০০৫ সময়ে

খাতসমূহ	২০০০-০১		২০০১-০২		২০০২-০৩		২০০৩-০৪		২০০৪-০৫	
	নৌযানের সংখ্যা	অংশ, %	নৌযানের সংখ্যা	অংশ, %	নৌযানের সংখ্যা	অংশ, %	নৌযানের সংখ্যা	অংশ, %	নৌযানের সংখ্যা	অংশ, %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক। সংগঠিত ঃ										
১। সরকারী ঃ										
ক) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনঃ	১৩	০৫.৫	১৩	০৫.৫	১৩	০৫.৯	১৩	০৬.৩	১৩	০৬.৩
খ) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশনঃ	২২৪	৯৪.৫	২২৩	৯৪.৫	২০৮	৯৪.১	১৯৪	৯৩.৭	১৯৪	৯৩.৭
মোট ঃ	২৩৭	১০০.০ (০৬.১)	২৩৬	১০০.০ (০৬.০)	২২১	১০০.০ (০৫.৫)	২০৭	১০০.০ (০৫.০)	২০৭	১০০.০ (০৫.০)
২। বেসরকারী ঃ	৩,৬২৮	৯৩.৯	৩,৬৯৮	৯৪.০	৩,৭৮৮	৯৪.৫	৩,৯১৪	৯৫.০	৩,৯৩৭	৯৫.০
সর্বমোট (১+২)	৩,৮৬৫	১০০.০ (০১.৪)	৩,৯৩৪	১০০.০ (০১.৫)	৪,০০৪	১০০.০ (০১.৬)	৪,১২১	১০০.০ (০১.৭)	৪,১৪৪	১০০.০ (০১.৭)
খ। অসংগঠিত ঃ										
১। সরকারী ঃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২। বেসরকারী ঃ	২৭৩,০০০	৯৮.৬	২৬৪,০০০	৯৮.৫	২৫৩,০০০	৯৮.৪	২৪৩,০০০	৯৮.৩	২৪৬,০০০	৯৮.৩
মোট ঃ	২৭৩,০০০	১০০.০ (৯৮.৬)	২৬৪,০০০	১০০.০ (৯৮.৫)	২৫৩,০০০	১০০.০ (৯৪.৪)	২৪৩,০০০	১০০.০ (৯৮.৩)	২৪৬,০০০	১০০.০ (৯৮.৩)
সর্বমোট ঃ	২৭৬,৮৬৫	১০০.০	২৬৭,৯৩৪	১০০.০	২৫৭,০০৪	১০০.০	২৪৭,১২১	১০০.০	২৫০,১৪৪	১০০.০

***উৎস ঃ ১**, পৃ: ২৫৫ – ২৫৬ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।*

হওয়ার এটা অন্যতম একটি বলা যায় প্রধান কারণ। পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো এর জন্যে দায়ী। কারণ তারা নৌ ও রেল পথকে চরমভাবে অবহেলা করেছে এবং সড়ক পথের বিকাশ ঘটিয়েছে জ্যামিতিক হারে। এ সম্পর্কে আমি আমার অন্য একটি লেখায় বিস্তারিত বলেছি (দেখুন, ৭)। আমাদের ধারণা যে, সমুদ্র পরিবহণ ও অসংগঠিত বেসরকারী খাতের অনিবন্ধিত পরিবহণ হিসেবে নিলে নৌ-পরিবহণের অংশ নি:সন্দেহে অর্ধেকের বেশী হতো, যেসম্পর্কে প্রবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে। অন্যদিকে সারণী-৩ এর তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেল,

বিআরটিসি (সড়ক) ও বিআইডব্লিউটিসি (নৌ) এর ভাড়া প্রায় সমান বা কাছাকাছি হলেও পণ্য বা মাল পরিবহণে নৌ-পরিবহণের ভাড়া এখনও সর্বনিম্ন (প্রতিটন মাত্র ১.১২ টাকা)।

নৌ-পরিবহণ অবকাঠামোর কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সমুদ্র বন্দরের কথা। তারপর আসে লঞ্চঘাট ও ল্যান্ডিং ষ্টেশনের ব্যাপারটি। একথা আমরা সবাই জানি যে, বাংলাদেশের কোন গভীর সমুদ্র বন্দর নেই, আছে শুধু দু'টি সমুদ্র বন্দর– একটি চট্টগ্রামে ও অন্যটি মঙ্গলায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে মাত্র ৩৭৩ টি লঞ্চঘাট ও ল্যাডিং ষ্টেশন আছে। দু:খজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের সকল জেলায় লঞ্চঘাট ও ল্যান্ডিং ষ্টেশন নেই। মাত্র ৪২টি জেলায় কম-বেশী লঞ্চঘাট ও ল্যান্ডিং ষ্টেশন আছে। বিভাগ ভিত্তিক এ ক্ষেত্রে রয়েছে চরম বৈষম্য (সারণী–৪)। সারণী–৪ এর তথ্যে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, ১৩৬টি (৩৬.৫%) ষ্টেশন নিয়ে বরিশাল বিভাগ এ ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে আছে। তার পরের দ্বিতীয় স্থানে আছে ঢাকা বিভাগ যার অধীন রয়েছে ১০২টি (২৭.৩%) ষ্টেশন। আর তৃতীয় স্থানটি গেছে চট্টগ্রামের দখলে, যার আওতায় রয়েছে ৮১টি (২১.৭%) ষ্টেশন। এরপর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে খুলনা, সিলেট ও রাজশাহী, যাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ৩৯টি (১০.৫%), ১০টি (০২.৭%) ও ০৫টি (০১.৩%)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে রাজশাহী অঞ্চলের বিষয়টি। রাজশাহী বিভাগটি অত্যন্ত বড় বিভাগ এবং নদীবহুল হওয়া সত্ত্বেও এখানে লঞ্চঘাট ও ল্যান্ডিং ষ্টেশন নেই বললেই চলে।

সারণী ২ : বাংলাদেশে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবহণের অংশ, ১৯৯৭–২০০২ সময়ে

বছর	পরিবহণের ধরন									
	যাত্রীবাহী					পণ্যবাহী				
	মোট, বি: যাত্রী কি: মি:	অংশ, %				মোট, বি: টন কি: মি:	অংশ, %			
		সড়ক	রেল	নৌ	মোট		সড়ক	রেল	নৌ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৯৯৭	৯০	৭২.০	১১.০	১৭.০	১০০.০	১২	৬৫.০	০৭.০	২৮.০	১০০.০
২০০২	১৫২	৭০.০	১২.০	১৮.০	১০০.০	১৯	৭২.০	০৮.০	২০.০	১০০.০

উৎস *ঃ ৬, পৃ: ৩৫৬ এর আলোকে হিসেবেকৃত।*

ঐতিহাসিকভাবে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ খাতটি সার্বিকভাবে অবহেলিত থেকেছে। ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। শত প্রতিকূলতা ও সম্পদের ঘাটতি সত্ত্বেও এ পরিকল্পনায় সরকারী খাতের মোট ব্যয়ের ১১.৭% দেয়া হয়েছিল। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোর কোন কোনটিতে আপেক্ষিক অংকে বরাদ্দ বাড়লেও তা মূলত: সড়ক উপখাতেই ব্যয় হয়েছে (সারণী–৫)। পরিবহণ খাতের ব্যয় বরাদ্দের আবার উপখাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাদে বাকীগুলোতে নৌ-পরিবহণ খাত সবচেয়ে অবহেলিত ছিল। সারণী – ৫ এর তথ্য থেকে আমরা সহজেই দেখতে পাচ্ছি যে, শুধুমাত্র প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুর আমলে পরিবহণ খাতের মোট বরাদ্দের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী

(৩৫.০%) নৌ-পরিবহণ খাতে দেয়া হয়েছিল। এর পর থেকে ধারাবাহিকভাবে নৌ-পরিবহণ খাতে বরাদ্দের অংশ হ্রাস পেয়েছে, অর্থাৎ দ্বি-বার্ষিক, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নৌ-পরিবহণ উপখাতে বরাদ্দের অংশ ছিল যথাক্রমে ২৪.০%, ২৫.০%.১৯.০%, ১২.০% ও ১১.০%। প্রায় একই অবস্থা ছিল রেলপথের ক্ষেত্রে। এ গুরুত্বপূর্ন উপখাতটির বরাদ্দ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পকিল্পনার ২৪.০% থেকে হ্রাস-বৃদ্ধির পর পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০.০% এ এসে ঠেকে। নৌ ও রেল পথের জন্যে সবচেয়ে হতাশাজনক সময় ছিল চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনায় উপখাত দু'টির বরাদ্দ যথাক্রমে ১২.০% ও ১৩.০% (সর্বনিম্ন) এ নেমে গিয়েছিল। আর নৌ-পরিবহণ উপখাতের বরাদ্দ সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌছায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১১.০%)। বিমান পরিবহণ উপখাতের অংশও বঙ্গবন্ধুর আমলের ১৩.০% থেকে অব্যাহতভাবে হ্রাস পেয়ে তিন দশকের ব্যবধানে অর্ধেকেরও নিচে নেমে যায় এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌছে খালেদা জিয়ার আমলে (মাত্র ৫.০%)। অপরদিকে একই সময়ে সড়কপথের অংশ বঙ্গবন্ধুর আমলের ২৮.০% থেকে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায় খালেদা জিয়ার আমলে (৫৪.০%)। আসলে পচাঁত্তর পরবর্তী সরকারগুলো দেশের ও জনগণের স্বার্থে কোনও কাজ করেনি। সবচেয়ে দরিদ্রবান্ধব পরিবহণ উপখাত নৌ-পরিবহণ উপখাত ও রেলপথের বিকাশকে রুদ্ধ করে তারা সড়কপথের বিকাশ ঘটিয়েছে অতি দ্রুত হারে। এতে দেশের জনগণের তেমন কোনও উপকার না হলেও শাসক গোষ্ঠি দূর্নীতির মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাত করার সুযোগ পেয়েছে, নষ্ট হয়েছে দেশের অতি মূল্যবান লক্ষ লক্ষ হেক্টর আবাদী জমি (৭)।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবহণ খাতে সরকারী বরাদ্দ অত্যন্ত কম। আর পরিবহণ উপখাতগুলোর মধ্যে আবার নৌ পরিবহনে বরাদ্দ সবচেয়ে কম। এত অল্প বরাদ্দকে নৌ-পরিবহণের মত বিশাল উপখাতের বহুমুখী কর্মসূচীর মধ্যে বন্টন করা এক দূরূহ কাজই বটে। সারণী–৬ এ উপস্থাপিত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নৌ-পরিবহণ উপখাতের সরকারী বরাদ্দের কাঠামো থেকে বিষয়টি আমরা আরও পরিস্কারভাবে বুঝতে পারি। সারণীর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নৌ-পরিবহণ উপখাতে বরাদ্দের অর্ধেকেরও বেশী (২২.০%+ ৩০.০%=৫২.০%) ব্যয় হয়েছে শুধু আভ্যন্তরীণ নদী ও কন্টেইনার বন্দর এবং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের কাজে। অথচ ড্রেজিং এর মত কর্মসূচীতে ব্যয় হয়েছে মাত্র ০৭.০% (০৪.০%+০৩.০%)। আর লঞ্চ ঘাট উন্নয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য রাখা হয়েছিল মাত্র ০৬.০%। এছাড়া নতুন ড্রেজার ক্রয়ের জন্যে ০৯.০%, ফেরী ও অন্যান্য নৌযান ক্রয়ের জন্য ১৩.০%, নৌযান পুণর্বাসনের জন্যে ০৩.০%, কন্টেইনার ও কার্গোর সরঞ্জাম প্রতিস্থাপনের জন্যে ০৭.০% এবং অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে মাত্র ০৩.০% বরাদ্দ রাখা হয়েছিল।

নৌ-পরিবহন ব্যবস্থায় বিআইডবি-উটি-এর ভূমিকা

বাংলাদেশের নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে"বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বা বিআইডব্লিউটিএ"। আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনের জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রক্ষনাবেক্ষণ,পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের জারীকৃত এক অধ্যাদেশ অনুসারে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একই সনের ১৮-ই নভেম্বর থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়। অধ্যাদেশ

সারণী ৩ : বাংলাদেশের সরকারী খাতের বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমের ভাড়ার তুলনামূলক চিত্র, ১৯৯৩-২০০০ সময়ে

পরিবহণ মাধ্যমের নাম	যাত্রী ভাড়া, যাত্রী প্রতি প্রতি কি:মি:, টাকা							মাল ভাড়া,* প্রতি টন প্রতি কি:মি: টাকা						
	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১। বাংলাদেশ রেলওয়ে	০.২৩	০.২৩	০.২৫	০.২৬	০.২৯	০.৩৫	০.৩৬	১.৩০	১.৩৭	১.৪১	১.২৪	১.৩৯	১.৪২	১.৪৭
২। বিআরটিসি	০.৩২	০.৩২	০.৩২	০.৩২	০.৩২	০.৩২	০.৪৭	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০
৩। বিআইডব্লিউটিসি	০.৩৩	০.৩৩	০.৩৩	০.৩৩	০.৩৩	০.২৬	০.২৬	১.১২	১.১২	১.১২	১.১২	১.১২	১.১২	১.১২
৪। বাংলাদেশ বিমান	২.৭৩	২.৬৯	২.৬২	২.৮৪	২.৮২	২.৯৪	২.৯৯	০.৪০	০.৪২	০.৪২	০.৪৩	০.৪৪	০.৪৫	০.৪৫

** বাংলাদেশ বিমানের ক্ষেত্রে প্রতি পাউন্ড প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া*

***উৎস** ঃ ৭ থেকে নেয়া হয়েছে।*

সারণী ৪ : অঞ্চলভিত্তিক বাংলাদেশের লঞ্চঘাট ও ল্যান্ডিং ষ্টেশনের পরিসংখ্যান, ২০০৫ সালে

বিভাগের নাম	অঞ্চলসমূহ				
	ষ্টেশন		জেলার নাম	ষ্টেশন	
	সংখ্যা	অংশ, %		সংখ্যা	অংশ, %
১	২	৩	৪	৫	৬
১। বরিশাল	১৩৬	৩৬.৫	১। বরিশাল	৪৭	১২.৬
			২। ঝালকাঠী	১২	০৩.২
			৩। পিরোজপুর	২১	০৫.৭
			৪। ভোলা	০৫	০১.৩
			৫। পটুয়াখালী	২৮	০৭.৫
			৬। বরগুনা	২৩	০৬.২
মোট:	১৩৬	৩৬.৫	মোট*	০৬	৩৬.৫
২। সিলেট	১০	০২.৭	১। সিলেট	০২	০০.৫
			২। মৌলভীবাজার	০১	০০.৩
			৩। সুনামগঞ্জ	০৩	০০.৮
			৪। হবিগঞ্জ	০৪	০১.১
মোট:	১০	০২.৭	মোট*	০৪	০২.৭
৩। খুলনা	৩৯	১০.৫	১। খুলনা	২২	০৬.০
			২। বাগেরহাট	১২	০৩.২
			৩। কুষ্টিয়া	০২	০০.৫
			৪। নড়াইল	০১	০০.৫
			৫। সাতক্ষীরা	২২	০০.৩
মোট:	৩৯	১০.৫	মোট*	০৫	১০.৫
৪। রাজশাহী	০৫	০১.৩	১। পাবনা	০১	০০.৩
			২। সিরাজগঞ্জ	০২	০০.৫
			৩। কুড়িগ্রাম	০১	০০.২
			৪। গাইবান্ধা	০১	০০.৩
মোট:	০৫	০১.৩	মোট*	০৪	০১.৩
৫। চট্টগ্রাম	৮১	২১.৭	১। চট্টগ্রাম	০২	০০.৫
			২। চাঁদপুর	৩৬	০৯.৭
			৩। কুমিল্লা	০৯	০২.৪
			৪। ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২০	০৫.৪
			৫। নোয়াখালী	০২	০০.৫
			৬। রাঙ্গামাটি	০৯	০২.৪
			৭। খাগড়াছড়ি	০১	০০.৩
			৮। লক্ষীপুর	০২	০০.৫
মোট:	৮১	২১.৭	মোট*	০৮	২১.৭
৬। ঢাকা	১০২	২৭.৩	১। ঢাকা		
			২। নারায়ণগঞ্জ		
			৩। শরীয়তপুর		
			৪। মাদারীপুর		
			৫। রাজবাড়ী		
			৬। মানিকগঞ্জ		
			৭। মুন্সিগঞ্জ		
			৮। ফরিদপুর		
			৯। নরসিংদী		
			১০। গোপালগঞ্জ		
			১১। নেত্রকোনা		
			১২। কিশোরগঞ্জ		
			১৩। গাজীপুর		
			১৪। টাঙ্গাইল		
			১৫। ময়মনসিংহ		
মোট:	১০২	২৭.৩	মোট*	১৫	২৭.৩
সর্বমোট:					
১+২+৩+৪+৫+৬:	৩৭৩	১০০.০	সর্বমোট:	৪২	১০০.০

** মোট জেলার সংখ্যা দেখানো হয়েছে।*

উৎস ঃ ৫, পৃ: ৩৭ – ৪৭ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

সারণী ৫ : বাংলাদেশের বিগত পরিকল্পনাসমূহে সরকারী খাতের বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমের উপ-খাতভিত্তিক বরাদ্দের চিত্র, ১৯৭৩ – ২০০২ সময়ে

পরিবহণের উপ-খাতসমূহ	প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮		দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৮-৮০		দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০-৮৫		তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০		চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯০-৯৫		পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭-০২	
	মোট, মি: টাকা	অংশ, %	মোট, মি: টাকা	অংশ, %	মোট, মি: টাকা	অংশ, %	মোট, মি: টাকা	অংশ, %	মোট, মি: টাকা	অংশ, %	মোট, মি: টাকা	অংশ, %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। সড়ক :	১,৪৯৬.১	২৮.০	১,৬৮৭.৯	৩৮.০	৪,০৯০.২	৩২.০	১১,৮৫৩.০	৩৯.০	৩৪,৬৫০.০	৫৪.০	৬৪,৯০৫.৫	৫৩.০
২। বঙ্গবন্ধু সেতু :	–	–	–	–	–	–	২,০০০.০	০৭.০	১০,০০০.০	১৬.০	১১,৮০০.০	১০.০
৩। রেলওয়ে :	১,২৬১.৩	২৪.০	১,২৩০.৮	২৭.০	৪,১৩৩.৯	৩২.০	৮,৩৬০.০	২৮.০	৮,৩৫০.০	১৩.০	২৪,০০০.০	২০.০
৪। নৌ পরিবহণ (বন্দর ও জাহাজসহ):	১,৮৬২.২	৩৫.০	১,০৯৮.৬	২৪.০	৩,১৬৮.৭	২৫.০	৫,৭১০.০	১৯.০	৭,৯৩০.০	১২.০	১৩,৫৫০.০	১১.০
৫। বিমান:	৬৫৬.৫	১৩.০	৪৮২.৭	১১.০	১,৪৭১.৮	১১.০	২,১০০.০	০৭.০	২,৮০০.০	০৫.০	৭,৫০০.০	০৬.০
মোট:	৫,২৭৬.১	১০০.০	৪,৫০০.০	১০০.০	১২,৮৬৪.৬	১০০.০	৩০,০২৩.০	১০০.০	৬৩,৭৩০.০	১০০.০	১২১,৭৫৫.৫	১০০.০
সরকারী খাতের মোট ব্যয়ের অংশ, %	১১.৭	–	১৩.৮	–	১১.৬	–	১২.০	–	১৬.৯	–	১৪.০	–

***উৎস** ঃ ৬, পৃ: ৩৫৩ – ৩৫৬ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।*

অনুযায়ী বিআইডব্লিউটিএ এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী হচ্ছে নিম্নরূপ (৫) ঃ

১। নৌ-পরিবহণের নাব্যতা সৃষ্টির জন্যে নৌ-সংরক্ষন ও নদী শাসন এবং নৌ-পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদীপথে মার্কা,বয়াবাতি, বিকনবাতিসহ নৌ সহায়ক সামগ্রী স্থাপন করা ;
২। হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং নৌ-পথের চার্ট প্রকাশ করা ;
৩। পাইলটেজ সুবিধা প্রদান করা ;
৪। নৌ-পথ এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করা ;
৫। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণের জন্যে ড্রেজিং কর্মসূচী প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং নতুন নৌ-পথ চালু করার উদ্দেশ্যে মৃত ও মৃতপ্রায় নদী, খাড়ি এবং খাল খনন করা ;
৬। অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর ও লঞ্চঘাট উন্নয়ন, রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং এগুলোতে টার্মিনাল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা ;
৭। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন অপসারণ ও নিমজ্জিত নৌযান উদ্ধার করা ;
৮। নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের জরিপ করা ;
৯। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামালের ভাড়া নির্ধারণ এবং যাত্রীবাহী নৌযানের সময়সূচী অনুমোদন করা ;
১০। গ্রামীণ নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে দেশীয় নৌকার মানোন্নয়ন ও যান্ত্রিকীকরণ করা ;
১১। অন্যান্য পরিবহণ মাধ্যম ও সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা ;
১২। অভ্যন্তরীণ নৌযানের নকসা অনুমোদন করা ;
১৩। নৌ-কর্মীদের জন্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

'সবিচালয়' হচ্ছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক কেন্দ্র। কর্তৃপক্ষের নানাবিধ নীতি নির্ধারণী কার্যাবলী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক কর্তৃপক্ষকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করার দায়িত্ব সচিবালয়ের উপর ন্যস্ত। বন্দর ও পরিবহণ বিভাগ কর্তৃপক্ষের অপারেশনাল বিভাগগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলী হচ্ছে: বিভিন্ন নৌ-পথে যাতায়াতকারী যাত্রী সাধারণের জন্য যেসমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, নৌযানের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা হতে প্রকৃত আয় নিরূপণ করা। এ বিভাগটি ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫৮ সালে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যে নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিও বিআইডব্লিউটিএ এর একটি অপারেশনাল বিভাগ। এর আওতাধীন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা, আরিচা ও সিরাজগঞ্জে শাখা অফিস রয়েছে। বর্ষাকালে প্রায় ৬,০০০ কি:মি: এবং শুষ্ক মৌসুমে ৩,৮০০ কি:মি: নৌ-পথ যথাযথ সংরক্ষণের দায়িত্ব এ বিভাগের উপর ন্যস্ত। সার্বিকভাবে এ বিভাগটি নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে:

১। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে নিরাপদে যাত্রী ও পণ্য উঠানামার সুবিধা নিশ্চিতকরণসহ দিবা-রাত্রি নৌযান চলাচলের নিমিত্তে নৌ-সংকেত ও নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সংরক্ষণ ;
২। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ও উপকূলীয় নৌ-পথ অতিক্রমণে নৌযান চলাচলের সহায়তার জন্য পাইলটেজ সুবিধা প্রদান ;
৩। বান্ডলিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ;
৪। নাব্য নৌ-পথে সৃষ্ট বাধা-বিঘ্ন অপসারণ ও নিমজ্জিত নৌ-যান উত্তোলন বা অপসারণ ;

সারণী ৬ : বাংলাদেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নৌ-পরিবহণ উপখাতে সরকারী বরাদ্দের কাঠামো ১৯৯৭–২০০২ সময়ে

দফাসমূহ	বরাদ্দ	
	মোট, মি: টাকা	অংশ, %
১	২	৩
১ । ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের উন্নয়ন	৬০০.০০	০৪.০
২ । নতুন ড্রেজার সংগ্রহ	১,২০০.০	০৯.০
৩ । অভ্যন্তরীণ নদী ও কন্টেইনার বন্দর	৩০০০.০	২২.০
৪ । লঞ্চঘাটের উন্নয়ন	৮০০.০	০৬.০
৫ । ফেরী ও অন্যান্য যান ক্রয়	১,৭০০.০	১৩.০
৬ । নির্বাচিত যানসমূহের পুণর্বাসন	৪০০.০	০৩.০
৭ । কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ	৪০০০.০	৩০.০
৮ । কন্টেইনার ও কার্গোর সরঞ্জামসমূহ প্রতিস্থাপন	১,০০০.০	০৭.০
৯ । মংলা বন্দরের সংরক্ষণ ড্রেজিং	৪০০.০	০৩.০
১০ । অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন	৪৫০.০	০৩.০
মোট	১৩,৫৫০.০	১০০.০

উৎস ঃ ৬, *পৃ: ৩৭৬ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।*

৫। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে বিভিন্ন লঞ্চঘাটে পন্টুন স্থাপন, প্রতিস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ;
৬। কর্তৃপক্ষের টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ;
৭। কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন নৌ-যান, জরীপ নৌ-যান ও বয় টেন্ডার নৌ-যান, টাগ জাহাজ, উদ্ধারকারী জাহাজ ও ওয়ার্কবোট পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ ;
৮। নিয়মিতভাবে ড্রাফট সীমা নির্দিষ্ট করে পাক্ষিক নৌ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রচার এবং প্রয়োজনে বিশেষ নৌ-বিজ্ঞপ্তি জারী করা ;
৯। আবহাওয়া সংকেত শাখায় ও জাহাজে প্রেরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের অপারেশনাল বিভাগগুলোর মধ্যে প্রকৌশল বিভাগটি অন্যতম। যাত্রী সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব এর উপর ন্যস্ত।

কর্তৃপক্ষের নৌ-যান ও নৌ-যন্ত্র সংক্রান্ত কারিগরি বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান ও প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে যান্ত্রিক নৌ-প্রকৌশল বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বিভাগের উপর অর্পিত দয়িত্বগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

১। কর্তৃপক্ষের জাহাজ বহরের যাবতীয় মেরামত কাজ সম্পন্ন করে জাহাজগুলোকে নৌ-পথে চলাচলের উপযোগী রাখা ;
২। প্রয়োজনে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মেরিন ও নৌ-স্থাপত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করা ;

৩। প্রয়োজনে লিভারমান, গ্রীজারসহ সকল প্রকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
৪। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচলকারী যাত্রীবাহী জলযান, টাগ, তেলবাহী ও মালবাহী জাহাজের ড্রয়িং এবং নকশা পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন করা ;
৫। এ ছাড়াও কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ধরনের নৌ-যান ও পন্টুনের বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণ, দরপত্র-দলিলপত্র প্রণয়ন, মূল্যায়ন, পরিদর্শণ ইত্যাদি কাজ করা।

ড্রেজিং বিভাগটি ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে পৃথক ইউনিট হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে এবং ২০০২ সালের ডিসেম্বরে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ বিভাগের দায়িত্বসমূহ হচ্ছে মূলত:

১। গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথসমূহ নৌ-যান চলাচলের উপযোগী নাব্য রাখার জন্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নৌ-পথসমূহে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ড্রেজিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ;
২। ড্রেজিং এর মাধ্যমে মৃতপ্রায় অগভীর নদী ও খালসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণ করা ;
৩। ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ড্রেজিং কাজের অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা এবং বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা ;
৪। ড্রেজার বহরের সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য বিভিন্ন শীপইয়ার্ড এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

অর্থ বিভাগ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় পরিকল্পনা ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলীর কেন্দ্র বিন্দু। এ বিভাগটির কার্য্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

১। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বাঅনৌক) সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সঙ্গে আলোচনা করে রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা ;
২। বাঅনৌক এর আর্থিক সম্পদ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখা এবং তা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা। বিভিন্ন রাজস্ব আদায় কেন্দ্রসমূহের প্রকৃত রাজস্ব আদায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকরণ এবং রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে প্রস্তাব উপস্থাপন করা ;
৩। বাঅনৌক এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক দিকসমূহ পরীক্ষা করা ;
৪। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সরকারের নিকট দাখিলের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা

বাঅনৌক এর ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগটির মূল দায়িত্বসমূহ হচ্ছে:

১। বাঅনৌক এর বিভিন্ন বিভাগের মালামাল ক্রয় ও সংরক্ষণ করা। মালামাল ক্রয়ের পর তা সংরক্ষণ এবং বিতরণের জন্য এ বিভাগের অধীনে ৩টি স্থানে মোট ৩টি গুদাম আছে: ক) ঢাকায় কেন্দ্রীয় গুদাম; খ) নারায়নগঞ্জে খানপুর গুদাম এবং গ) বরিশালে বরিশাল আঞ্চলিক গুদাম।
২। বাঅনৌক এর গুদামে রক্ষিত মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অপ্রচলিত ও ওটিআর মালামাল টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
৩। এছাড়া আমদানীকৃত মালামাল খালাস ও বিমান বন্দর থেকে মালামাল খালাসের জন্যে এজেন্ট নিয়োগের কাজটিও এ বিভাগ করে থাকে।

হিসাব বিভাগ বাঅনৌক এর যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। যেহেতু বাঅনৌক এর সকল বিভাগের যাবতীয় প্রাপ্তি ও পরিশোধের ক্ষেত্রে হিসাব বিভাগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে,

সেহেতু এ বিভাগকে অন্যান্য সকল বিভাগের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। বাঅনৌক যেহেতু একটি অবানিজ্যিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, তাই প্রাপ্তি ও পরিশোধকে নিয়ে সনাতনী লাভ-লোকসান হিসাবের পরিবর্তে দেয়-প্রদেয়ের ভিত্তিতে প্রতি বছর আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং স্থিতিপত্র প্রণয়ন করা হয়ে থাকে, যা এ বিভাগের একটি মৌলিক কাজ। বাঅনৌক এর সকল খরচের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রথমত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ বিভাগ কর্তৃক পূর্ব নিরীক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতে বার্ষিক হিসাবসমূহ সরকারী নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষিত হয় ও পেশাদার চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্ম কর্তৃক চূড়ান্ত হিসাব প্রণীত হয়।

নিরীক্ষা বিভাগটি বিগত ১৯৮৪ সাল থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ রূপে বাঅনৌক এর অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ বিভাগটি মূলত: নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে:

১। প্রধান কার্যালয় এবং বহি:কেন্দ্রের সকল অফিস ও ভান্ডার পরিদর্শন এবং নিরীক্ষার লক্ষ্যে কার্যকর ও সুসংগঠিত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন ;
২। অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর ও ক্যানেলের আদায় কেন্দ্রসহ সকল বহি:হিসাব এবং রাজস্ব অফিসের মূল হিসাব বহিসমূহ পরীক্ষা করা ;
৩। স্থানীয় সরকারী নিরীক্ষা দপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত সকল অডিট আপত্তির রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;
৪। সকল হিসাব অফিস পরিদর্শন এবং সকল রাজস্ব আদায় কেন্দ্রের তহবিল ব্যাংকে জমাকরণ বিষয়টি যাচাই ও মিলিকরণ করা ;
৫। ভান্ডার পরিদর্শন ও ভান্ডার সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই ও মিলিকরণ করা ;
৬। পাবলিক হিসাব কমিটিতে বাঅনৌক এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা।

ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি অভ্যন্তরীণ নৌযান শ্রমিকদের একমাত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এটি একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রশিক্ষণার্থীগণ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন নৌযানে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়। ১৯৭১সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ নৌযানের জন্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই এই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। এটি নারায়নগঞ্জে অবস্থিত। বর্তমান এখানে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে:

১। নৌ-শিক্ষানবিস কোর্স ঃ এ কোর্সের মেয়াদ এক বছর। নৌ-বিদ্যায় দক্ষ করা এই কোর্সের প্রধান উদ্দেশ্য।

২। ইন-সার্ভিস কোর্স ঃ আমাদের দেশের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী নৌযানে চাকরিরত কর্মীদের বিভিন্ন শ্রেণীর মাষ্টারশীপ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া ও দক্ষতা বৃদ্ধি এই কোর্সের মূল লক্ষ্য।

৩। বিট পাইলট ও মাষ্টার পাইলট ঃ বাঅনৌক এর নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগে কর্মরত পাইলট ও মাষ্টার পাইলটদের পেশাদার এবং দক্ষ পাইলট হিসেবে গড়ে তোলাই এর প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া সময় সময় নব্য নিয়োগকৃত নৌ-সংরক্ষণ ও হাইড্রোগ্রাফি বিভাগের কর্মকর্তাদেরকেও নৌ-পথ এবং নৌযানের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

বর্তমানে প্রচলিত কোর্সগুলো ছাড়াও সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত কোর্সগুলোও এখানে দেয়া হচ্ছে: ক) পার্সোনাল সার্ভাইভাল টেক্‌নিক্‌ (পিএসটি) ; খ) পার্সোনাল সেফ্‌টি ও সোসাল রেস্‌পন্সিবিলিটি (পিএসএসআর) ; গ) ফায়ার প্রিভেনশন ও ফায়ার ফাইটিং (এফপিএফএফ) ; ঘ) এলিমেন্টারী ফার্ষ্ট এইড (ইএফএ) ; ঙ) বিএসটি, রাডার ও ভিএইচএফ অপারেশন।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র ও নৌ-পরিবহণ

২০০৫ সালে প্রণীত বাংলাদেশের তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র আসলে হচ্ছে একটি দারিদ্র লালন কৌশল পত্র (৮)। আর তাই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গোটা কৌশল পত্রে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সম্পর্কে মাত্র দু'টি লাইন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (৪, পৃ: ১১৪)। এটি যে আমাদের দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথা দারিদ্র্য বান্ধব পরিবহণ মাধ্যম সেসম্পর্কে কোনও বক্তব্য এতে নেই। অথচ কে না জানে যে, এর সাথে আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা জড়িত রয়েছে। নৌ-পরিবহণ উপখাতে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে যার কানাকড়িও আমরা বাস্তবে রূপ দিতে পারি নি। আমাদের দেশের শাসক গোষ্ঠি বিশেষ করে পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলোর অব্যাহত অবহেলার শিকার হয়েছে এ গুরুত্বপূর্ণ উপখাতটি। আর এ অবহেলার চরম বহি:প্রকাশ ঘটেছে উপরোক্ত কৌশল পত্রে। মানুষের কর্মসংস্থানই যদি বৃদ্ধি না পায়, তা'হলে দারিদ্র্য দূর হবে কেমনে? নৌ-পরিবহণের মত কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি সম্ভাবনাময় খাতকে অবহেলার মাধ্যমে কৌশল পত্র প্রণেতারা আসলে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তা'ছাড়া আমাদের দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে আধুনিক নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেও তারা ব্যর্থ হয়েছেন বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশের নৌ-পরিবহণ উপখাতের সমস্যাসমূহ ও এর উন্নয়নে করণীয়

আমাদের দেশের নৌ-পরিবহণের সমস্যাসমূহের সমাধান ও এর সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে আমরা মনে করি নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী ঃ

১। ***নাব্যতা সমস্যা ঃ*** এ সমস্যাটি বর্তমানে সংকটজনক অবস্থায় পৌছেছে। এর সমাধানের জন্যে একদিকে যেমন নদী কাটা প্রয়োজন, অন্যদিকে নদীর গভীরতা ঠিক রাখার জন্যে সারা বছর অর্থাৎ স্থায়ী ড্রেজিং এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

২। ***নদী শাসন ও জমি উদ্ধার ঃ*** আমাদের নদীগুলো অত্যন্ত প্রসস্ত হওয়া সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, শুস্ক মৌশুমে সেগুলোর অধিকাংশই শুকিয়ে যায় এবং বেশ কিছু নদী ইতোমধ্যেই মৃত নদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর একটি সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের নদীগুলো অত্যন্ত আঁকা-বাঁকা এবং এ কারণে বর্ষা মৌশুমে ভয়াংকরভাবে ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। আমরা মনে করি যে, যতটা সম্ভব নদীর বাকগুলো সোজা করতে হবে এবং যথাসম্ভব তীরসমূহ কংক্রিটে বাঁধাই করতে হবে বিশেষ করে শহর-নগর ও বাকগুলোর দুই পাশ। চীনারা যদি তাদের দুঃখ হোয়াংহো নদীর দুই পাশ বাঁধাই করে তাকে চীনের আশির্বাদে রূপান্তরিত করতে পারে, তা'হলে আমরা কেন পারবো না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমাদের নদীগুলো সুপ্রসস্ত। এত বড় নদী আমাদের প্রয়োজন নেই। এমনিতেই আমাদের দেশের আয়তন অত্যন্ত স্বল্প এবং আবাদী জমির পরিমাণও কম। কাজেই নদী থেকে আমাদেরকে জমি উদ্ধার করতে হবে। আমাদের নদীগুলোকে গড়ে ২০-২৫ মিটার গভীরতায় ধরে রাখার স্থায়ী ব্যবস্থা করতে

পারলে অবশ্যই নদীগুলো থেকে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি উদ্ধার করে তাকে আবাদী জমি ও বনভূমিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। চীনারা যদি মরুভূমির (গোবি অঞ্চল) ২-৩ মিটার বালু ও পাথর অপসারণ করে দূরদেশ থেকে পানি এনে তাকে আবাদী ও বনভূমিতে রূপান্তরিত করতে পারে, তা'হলে আমরা নদীর জমি কেন উদ্ধার করতে পারবো না। হাওর-বাওর ও খাল-বিলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া যায়। এগুলোকে যথেষ্ট গভীর করে খনন করলে আয়তন কমিয়ে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি উদ্ধার করা সম্ভব। আমাদের দেশে নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস শুষ্ক মৌশুম বিদ্যমান থাকে। এ সময়ে কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে নদ-নদী, খাল বিল ও হাওর-বাওরের মাটি কাটার কাজ করানো সম্ভব। আর এতে করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে কাজ দেয়া সম্ভব হবে এবং এটা আমাদের দেশের দারিদ্র্য লাঘবেও যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি। আর এভাবে উদ্ধারকৃত জমিতে ভূমিহীনদের পূনর্বাসন করা যেতে পারে এবং সরকারী উদ্যাগে বনায়ন করা যেতে পারে। সম্ভব ক্ষেত্রে দরিদ্রদের সমবায় করে জলমহল, জমি-জমা, বন, বালুমহল ইত্যাদি উক্ত সমবায়ের ব্যবস্থাপনায় ন্যাস্ত করা যেতে পারে।

৩। নৌ-যানের আধুনিকায়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ ঃ এটি আমাদের দেশের নৌ-পরিবহণের একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের নৌ-যানসমূহের সিংহভাগই ভাঙ্গাঁ-চোড়া ও অত্যন্ত নিম্ন মানের হওয়াতে প্রায়সই দুর্ঘটনা কবলিত হয় বিশেষ করে ঝড়-বাদলের মৌশুমে। কাজেই আমাদের দেশে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নৌ-যান তৈরীর অত্যাধুনিক কারখানা গড়ে তুলতে হবে এবং উৎপাদিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

৪। দক্ষ জনশক্তির অভাব ঃ আমরা মুখে যতই বলি না কেন, যথেষ্ট দক্ষ জনবল ছাড়া কখনই একটি দক্ষ ও আধুনিক নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নৌ-পরিবহণের মত এত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি উপ-খাতের জন্যে গোটা দেশে বাঅনৌক এর অধীনে মাত্র একটি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট আছে, যে সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নৌ-দুর্ঘটনার জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অদক্ষ জনবল দায়ী বলে আমরা মনে করি। অতএব, এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, গুরুত্বপূর্ণ এ উপ-খাতটির জন্যে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সারা দেশব্যাপী বিশেষ করে নদী বহুল এলাকাগুলোতে (কক্সবাজার, টেকনাফ, হাতিয়া, সন্দীপ, ভোলা, লক্ষীপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চাঁদপুর, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর প্রভৃতি) প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট গড়ে তুলতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে নৌ-পরিবহণ, নদী শাসন ও পানি ব্যবস্থাপনার মত বিষয়সমূহের উপর বিভাগ ও অনুষদ খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। নিরাপত্তা ও বীমার অনুপস্থিতি ঃ আমাদের দেশে নৌ-পথের নিরাপত্তা এবং নৌ-যান ও যাত্রী সাধারনের জন্যে বীমার কোনও ব্যবস্থা নাই। আমরা মনে করি যে, নৌ-পথের নিরাপত্তার জন্যে আধুনিক এক নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। আর দুর্ঘটনা হ্রাসের লক্ষ্যে নৌ-যান ও যাত্রী সাধারনের জন্যে বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। প্রতি যাত্রী ভাড়ার বা প্রতি টন মালের ভাড়ার একটি ক্ষুদ্র অংশ (১%) কেন্দ্রীয় বীমা তহবিলে বাধ্যতামূলকভাবে জমা করতে হবে। এ ব্যাপারে বীমা কোম্পানীগুলোর সাথে চুক্তি করতে হবে। আর দুর্ঘটনা কবলিত নৌ-যানের মালিক ও হতাহত যাত্রী সাধারণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য মালিকদের এ তহবিল থেকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৬। বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ব্যবস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা ঃ বর্তমানে আমাদের দেশে বিদ্যমান নৌ-

যানসমূহের সিংহভাগই নিবন্ধন ছাড়া নৌ-পথ ব্যবহার করছে, যা নৌ-পরিবহণ উপখাতে দুর্নীতি ও নৈরাজ্যজনক অবস্থা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, নৌ-যান মালিকরা ফি বছর সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় প্রশাসনে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করবেন তাদের নৌ-যানের। এর ফলে তাদের উপর স্থানীয় প্রশাসনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের আয়ও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

৭। বাঅনৌক এর আধুনিকায়ন ঃ এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে সেকেলে পদ্ধতিতে চলছে। এর আধুনিকায়ন আবশ্যক। এর কেন্দ্রীয় অফিস থেকে আরম্ভ করে বন্দর, টার্মিনাল প্রভৃতি সব জায়গায় আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ও কনভেয়ার ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এতে করে এ প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই দুর্নীতিমুক্ত হবে বলে আমরা মনে করি এবং এর আয়ও অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। তা'ছাড়া এর নৌ-যান বহরকে সমৃদ্ধ করতে হবে। আরও নতুন নতুন অত্যাধুনিক জাহাজ এ বহরে সংযুক্ত করতে হবে। অত্যাধুনিক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির আরও কারখানা স্থাপন করে এর বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত ভিতকে মজবুত করতে হবে যাতে করে ভবিষ্যতে এ প্রতিষ্ঠানটি আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

৮। নৌ-পরিবহণ উপ-খাতে বরাদ্দ ঃ নৌ-পরিবহণ ও রেল পরিবহণের মত দারিদ্য বান্ধব উপ-খাতগুলোতে বরাদ্দের অপ্রতুলতা এগুলোর বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা যেসম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি। আমাদের বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি যে, সবচেয়ে কম বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে নৌ-পরিবহণে, তার একটু উপরে আছে রেল পরিবহণ, আর সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ পাচ্ছে সড়ক পরিবহণ উপ-খাত (সারণী-৬)। কাজেই আমরা মনে করি যে, নৌ-পরিবহণের সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে এ উপ-খাতে বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে এবং অব্যাহতভাবে বাড়াতে হবে।

৯। অসমন্বিত বিকাশ ঃ এটি সার্বিকভাবে আমাদের দেশের আমলা ও দাতা নির্ভর অর্থনীতির জন্যে একটি গুরুতর সমস্যা। এটি বিশেষভাবে সত্য পরিবহণ খাতের জন্যে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, দেশের দ্রুততর প্রবৃদ্ধির ও উন্নতির জন্যে একটি সুসমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থাকে অবশ্যই রেল ও সড়ক পরিবহণের সাথে সমন্বিত করে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, একটি আধুনিক ও সুসমন্বিত পরিবহণ নেটওয়ার্কই পারে আমাদের দেশের উন্নতির চাকাকে গতি দিতে। চীন ও ভারত কিন্তু এ কাজটিই করছে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে। এমনিতে কি আর চীনের প্রবৃদ্ধি বিগত তিন দশক যাবত ডাবল ডিজিটে অবস্থান করছে, আর ভারতের তা ডাবল ডিজিট ছুঁই ছুঁই করছে ?

১০। ব্যবস্থাপনার সমস্যা ঃ সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, আমাদের দেশের সবচেয়ে বিশৃংখলাপূর্ণ ও নৈরাজ্যপূর্ণ খাত হচ্ছে পরিবহণ খাত। এর মধ্যে নৌ-পরিবহণ উপ-খাত সবচেয়ে বেশী নৈরাজ্যপূর্ণ। আমরা মনে করি যে, নৌ-পরিবহণ একটি বিশাল ব্যাপার। এর সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত নদী শাসন ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপার ; নৌ-যান ও নৌ-পথ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের মত ব্যাপার; এছাড়াও রয়েছে বন্দর, ঘাট ও নৌ-কর্মী, মালিক ইত্যাদি বিষয়গুলো। কাজেই আমরা মনে করি যে, এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, বিদ্যমান একটি মন্ত্রণালয়ের স্থলে তিনটি মন্ত্রণালয়ের উপর নৌ-ও সমুদ্র

পরিবহণের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে ঃ ১। নদী শাসন ও ড্রেজিং মন্ত্রণালয় যা শুধু নদী, খাল-বিল, ইত্যাদি খনন, জমি উদ্ধার, বনায়ন, পাড় বাঁধাই, পর্যটন স্পট গড়ে তোলার মত কাজগুলো করবে। সারা বছরব্যাপী নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষাই হবে এর প্রধান কাজ; ২। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রনালয় যার দায়িত্ব হবে বন্দর, টার্মিনাল, ঘাট ও নৌ-পথের ব্যবস্থাপনাসহ যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো দিকভাল করা; ৩। সমুদ্র পরিবহণ মন্ত্রণালয় যার কাজ হবে আমাদের দেশের আমদানী ও রপ্তানী পণ্যবাহী সমুদ্র যানসমূহের ব্যবস্থাপনাসহ সমুদ্র বন্দরগুলোর দিকভাল করা।

১১। আইনগত কাঠামো ঃ আইনগত কাঠামোকে মজবুত করতে হবে। ঐপনিবেশিক আমলের অপ্রয়োজনীয় ও সেকেলে আইন ও বিধি-বিধান পরিবর্তন বা বাদ দিয়ে যুগের চাহিদা পূরণে সক্ষম নতুন আইনী কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। আর আইনের কঠোর বাস্তবায়নের দিকে জোর দিতে হবে।

১২। দুর্নীতি প্রসঙ্গ ঃ দুর্নীতি আমাদেরকে আগাতে দিচ্ছে না। বর্তমান তত্ত্বধায়ক সরকার দুর্নীতি বিরোধী অভিযান শুরু করেছে। এ অভিযানকে সর্বব্যাপী ও স্থায়ী রূপ দিতে হবে। নৌ-পরিবহণ উপ-খাতকেও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি থেকে শুরু করে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বৈষয়িক ও নৈতিক প্রণোদনার ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এগুলো ছাড়া সুশাসন কায়েম সম্ভব নয়। আর সুশাসন ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়।

উপসংহার

সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছর হয়ে গেছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন হয়েছে। এ সময়ে দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। অথচ এ বিপুল জনসংখ্যাকে আমরা জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি নি। আমাদের জনগণের ছয়টি মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান) রয়ে গেছে অপূর্ণ। আজকে আমাদের শিক্ষার বেহাল দশা, কৃষি ও শিল্পে নেমেছে ধ্বস, বিদ্যুত খাতে হযবরল অবস্থা, আর পরিবহণে চলছে মহানৈরাজ্য। পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর কুপরামর্শে ব্যক্তি খাতের বিকাশের স্বার্থে একে একে আমাদের দেশের কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো ও শিক্ষাসহ সকল খাতের সর্বনাশ করেছে। পরিবহণের ক্ষেত্রে রেল ও নৌ-পরিবহণকে ধ্বংস করে সড়ক পরিবহণকে উৎসাহিত করেছে। প্রায় আড়াই লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে যার সিংহ ভাগই ব্যবহার অনুপোযোগী। এতে করে বাংলাদেশের উপকারের চেয়ে অপকার হয়েছে বেশী ঃ হাজার হাজার হেক্টর মূল্যবান আবাদী জমি নষ্ট হয়েছে, বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে, পরিবহণ ব্যবস্থায় এসেছে নৈরাজ্য, বেড়েছে পরিবহণ ব্যয়। অথচ রেল ও নৌ-পরিবহনের বিকাশ ঘটাতে পারলে আমাদের দেশের অর্থনীতির বিকাশ যেমন ত্বরান্বিত হতো, ঠিক তেমনি জনগণেরও কল্যাণ বৃদ্ধি পেতো, থাকতো না বিদ্যমান নৈরাজ্য। অতএব, সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়ানোর। নৌ- ও রেল পরিবহণকে অগ্রাধিকার দিয়ে ঢেলে সাজাতে হবে আমাদের গোটা পরিবহণ ব্যবস্থাকে। গড়ে তুলতে হবে যুগোপযোগী, আধুনিক ও সুসমন্বিত এক পরিবহণ ব্যবস্থা যা আমাদের দেশের টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত।

গ্রন্থপঞ্জী

১। B.B.S, GOB: *Statistical Pocketbook of Bangladesh* 2005, Dhaka, November, 2006.

২। Economic Adviser's Wing, Finance Division, Ministry of Finance: *Bangladesh Economic Review* 2006, Dhaka, January, 2007.

৩। Bangladesh Inland Water Transport Corporation (BIWTC): *Annual Report* 2002-2003 and 2003-2004, Dhaka.

৪। Planning Commission, GOB: *Unlocking the Potential – National Strategy for Accelerated Poverty Reduction*, October 16, 2005.

৫। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ: *বর্ষপত্র ২০০৪-২০০৫*, ঢাকা।

৬। পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : *পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা* ১৯৯৭-২০০২, মার্চ, ১৯৯৮, ঢাকা।

৭। খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পঞ্চদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ডিসেম্বর, ২০০৪, ঢাকা।

৮। খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র- বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের আরও একটি ব্যর্থ প্রয়াস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির যৌথ উদ্দ্যোগে আয়োজিত আঞ্চলিক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, জুলাই, ২০০৬, রাজশাহী।

৯। খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ বাংলাদেশের বিদ্যুতায়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা, *আইবিএস জার্নাল ১৪০৬ঃ৭*, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৬, ২০০০।

১০। খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিদ্যুৎ খাতের ভূমিকা, *বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি*, চতুর্দশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৮।

১১। চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম ঃ *আর্থনীতিক ভূগোল: বিশ্ব ও বাংলাদেশ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮।

১২। রহমান মোঃ আনিসুরঃ *বাংলাদেশে সমাজ চেতনা ও সমাজ রূপান্তর ঃ বহু সমাজ থেকে এক সমাজ*, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ, সেপ্টেম্বর, ২০০৬, ঢাকা।

১৩। রহমান মোঃ আনিসুর ঃ *'দারিদ্য' চিন্তার মানবিকীকরণ এবং দেশীয় দারিদ্র্য-জ্ঞানতত্ত্ব নির্মাণের পথে*, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পঞ্চদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত বিশেষ প্রবন্ধ, ডিসেম্বর, ২০০৪, ঢাকা।

১৪। সাপ্তাহিক একতা।

১৫। দৈনিক সংবাদ।

১৬। দৈনিক জনকণ্ঠ।